দেখা অদেখা ঢাকা

মুহাম্মদ আরিফুর রহমান
আহমেদ রাশেদ

দেখা অদেখা ঢাকা
মুহাম্মদ আরিফুর রহমান
আহমেদ রাশেদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখকদ্বয়

প্রচ্ছদ
অনুপম হুদা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৪০০ টাকা

Dekha Odekha Dhaka by Muhammad Arifur Rahman & Ahmed Rashed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97450-7-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

ঢাকাবাসী
ও
আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়
মরহুম সাঈদ আহমদ স্যার

ভূমিকা

কবি জীবনানন্দ দাশ কিংবা পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন যেভাবে পল্লীগ্রামের নদীর পাড় ধরে বা ধানক্ষেতের আইল ধরে হেঁটে হেঁটে কবিতা লিখতেন, সেখানে এই বইয়ের লেখকদ্বয় ঢাকার অলিগলিতে দাঁড়িয়ে এ জনপদের গোড়ার ইতিহাস থেকে শুরু করে আশির দশকের তৎকালীন নগরজীবনে ঘটে যাওয়া নানা রঙের ঘটনা এঁকেছেন কলমের লেখনীতে। ঢাকার ভিতরে ঢাকাকে তুলে এনেছেন এই *দেখা অদেখা ঢাকা* গ্রন্থে।

লেখক বন্ধু আহমেদ রাশেদের গল্পগুলি গবেষণাধর্মী। ঢাকা নিয়ে অনেকদিন সে গবেষণা করছে। টুকটাক এদিকে সেদিকে লিখেছেনও বেশ। তবে তাঁর লেখাগুলি গ্রন্থ আকারে এতদিন পর কেনো প্রকাশিত হচ্ছে, এর উত্তর জানা নেই। আরো আগেই হতে পারতো। রাশেদের গল্প বলার ঢং কোথাও ইতিহাস নির্ভর গবেষণা, আবার কখনো শৈশবকে হাতড়ানো। এই শৈশবের বেড়ে ওঠার সময়টা লেখককে তাড়িয়ে ফেরে তাঁর লেখাতে।

বন্ধুসম স্নেহাস্পদ লেখক মুহাম্মদ আরিফুর রহমানের লেখাতে একটা আনন্দ আছে। তিনি সেকালের ঢাকার গল্প লিখেছেন বেশ মজা করে। ইতিহাস, কিন্তু গল্প। নিজের ছেলেবেলার স্মৃতিচারণের সাথে পুরনো আখ্যান খুঁজেছেন, নগরজীবনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, ঐতিহ্যের গল্প বলেছেন আরিফ।

ঢাকাইয়া বুলি, সারা বঙ্গদেশের মানুষের বড্ড আগ্রহ এ ভাষা নিয়ে। তেমনি ঢাকার রমজান ও ইফতার, হালখাতা এবং রাজধানী ঢাকার গড়ে ওঠা এসবেও আগ্রহী মানুষ। এসব বিষয় সহজ গল্প বলার ঢঙে তুলে এনেছেন লেখকদ্বয় এই গ্রন্থে। তেমনিভাবে এসেছে আধুনিক স্থাপত্য আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রতীক শহীদ মিনার ও তার রূপকার শিল্পী হামিদুর রাহমানের কথা।

গ্রন্থটিতে বুড়িগঙ্গা নদী এই প্রাচীন নগরজীবনের মানুষ ও তাঁদের স্বকীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে খুব সাবলীলভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন লেখকদ্বয়। পাঠকের ভালো লাগবে পড়তে।

রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম
সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগ
চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

নগরকে যদি আমরা একটি বাগান হিসেবে কল্পনা করি,তাহলে যে কোনো নগরের প্রতি নাগরিকের ভালোবাসার অনুভূতি এমন একটা গাছ যেটা বাগানের বাইরে জন্মায়, কিন্তু সেই বাগানের সবকিছু এর ভেতর থাকে। বাইরে থেকে ও ভেতর থেকে রস আস্বাদন করে বেড়ে উঠে। মাটিকে দৃঢ ভাবে আঁকড়ে ধরে সাক্ষ্য দেয় সে," আমরা এই জমিনে দাঁড়িয়ে আছি বহুত ক্ষন ধরে, যুগ যুগ ধরে। কিন্তু আসলে আমাদের কারোর বয়স ২৫, কারোর ৪২ বা ৫২, কারোর বা ৮৯। আমাদের আগে শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, হাজার বছরের কৃষ্টি ও সভ্যতা পেরিয়ে গেছে।আমরা সাক্ষী"।

আমরা সাক্ষী, এক সময় মোগল শাসনকর্তা নুরউদ্দিন মুহম্মদ সেলিম জাহাঙ্গীরের হুকুমে এসেছিলেন এই সারজামিনে, যার নাম ইসলাম খান চিশতী। ১৬১০ সালের জুলাই মাসে।

আমরা সাক্ষী, এ শহর ছিল এক রাজকীয় কানন। এমনকি মোগলদের নথিপত্রেও এ শহরকে 'জান্নাতুল বিলাদ' বা 'নগরীর মধ্যে বেহেশত' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।বৃটিশরা বলত 'ভারত বর্ষের রাণী'। নগরসমূহের রানী ঢাকার ইতিবৃত্ত 'দেখা অদেখা ঢাকা'।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা নগর ঢাকার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ পেয়েছি। ঐতিহাসিক যুগ বিভাজনে তাই ঢাকার ঐশ্বর্য্যময় ঐতিহ্য আমরা লালন করেছি আমাদের মনে। কৈশোর ও যৌবনে পা দেবার পর বিশাল ও বিস্ময়কর প্রাচীন এই ঢাকার ইতিহাসের গল্প উপলব্ধি করে উপভোগ করেছিলাম আমাদের নানী-দাদী, বাবা-মা, বিশ্বখ্যাত নাট্যকার সাঈদ আহমদ ও প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ ড. আব্দুল মোমিন চৌধুরী, প্রফেসর মীর শহীদুল ইসলাম (সাবেক ভিসি, চুয়েট), ডাঃ মীর নিজামুদ্দীন আহমেদ, কবি ফজল শাহাবুদ্দীনের সাহচর্যে।

সেই সব দিনরাত্রির ঢাকা ছিল আশ্চর্য সব গল্পের রঙিন জগত। ষড়ঋতুতে খোলা আকাশের নিচে রঙিন সব গল্পগুলো যেন পসরা সাজিয়ে বসত মসলিন পরিহিতা নববধূর মত।

'দেখা অদেখা ঢাকা' সেকালের ঢাকার ছয় ঋতুর ছয় রঙের ছবি। সেই দিন, সেই সময়, সেই সব মানুষ আর তাদের যাপিত জীবনের দৃশ্যের ভেতরের দৃশ্যের কৌতুহলোদ্দীপক কিসসা কাহিনী। ক্যালাইডোস্কপিক যাপন- তাকেই ধরার প্রয়াস এই বইটিতে, ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন গল্পের শিরোনামে।

বন্ধুত্ব আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। আমাদের জীবনের সেই আশীর্বাদ দ্বিগুণ হয়ে এসেছে বন্ধু প্রতিম বড় ভাইদের কল্যাণে। তেমনি সাত জন ব্যক্তিত্ব : ঢাকার ইতিহাস প্রেমী আজিম বখশ, ঢাকার ইতিহাসবিদ হাশেম সূফী, স্থপতি মহিবুল আরেফিন খান (গালিব), ইঞ্জিনিয়ার সাঈদ আহমেদ বাসেত (পাপ্পু), মোহাম্মদ সালেক, সৈয়দ নকীব মাহমুদ ও জয়দীপ দে শাপলু। তারা সবাই 'দেখা অদেখা ঢাকাকে' ধারণ করেছেন আত্মিকভাবে। সারা জীবনের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন সজল আহমেদ বইটি প্রকাশ করে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা ডঃ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান খানের প্রতি যার অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসার কোন তুলনা নেই। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য যাদের উৎসাহ আমাদের উদ্দীপনা যুগিয়েছে সব সময়। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা রেজা আসাদ আল হুদা অনুপমের প্রতি দেখা অদেখা ঢাকার অনিন্দ্য সুন্দর প্রচ্ছদ শিল্পের জন্য।

"দেখা অদেখা ঢাকা"আন্তরিক কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম।

মুহাম্মদ আরিফুর রহমান
আহমেদ রাশেদ

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

সূচিপত্র

মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

সেকালের ঢাকার কাবুলিওয়ালা ও বোম্বাইয়া হাজীর গল্প ১৩
ঢাকার ছেলে ভানু ১৫
ঢাকা থেকে মক্কা, সেকালের হজের গল্প ১৯
নাজির হোসেনের ঘোড়া, ভাওয়াল রাজার গাড়ি, দিলীপ কুমার সওয়ারি ২২
ঢাকায় একখন্ড চায়না টাউন ছিল ২৭
ঢাকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও পাঙ্খা পুলারের গল্প ৩০
সুজন সখা 'তারা মসজিদ' ৩৩
চির বসন্তের ঢাকাতে বসন্ত মহামারি ৩৬
ঢাকায় বেঙ্গল রেজিমেন্টের গোড়াপত্তন ৩৮
নেতাজির শেষ জনসভা, কালের সাক্ষী ঢাকা ৪২
ঢাকার ছেলে পথ দেখাল ৪৫
পেঁপে বৃত্তান্ত ও জীবনানন্দ দাশের বিয়ে ৪৭
ঢাকার মসৃণ মসলিন ৫০
চকবাজার শাহী মসজিদের স্ন্যাপ শট ৫৩
রিকশা ও তার কারুকার্য ৫৫
ঢাকার রোজাখোলাইয়ের ক্যানভাস ৫৮
পলাশী ব্যারাক ও তারাদামের সন্ধানে ৬০
একাত্তরে ঢাকার জয়বাংলা মার্কেট ৬৩
ঢাকার ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া গরুর গল্প ৬৫
মোহনীয় মঙ্গলাবাস ৬৭
রেভ্যুলুশনারী ঢাকা ও দীনবন্ধু মিত্র ৬৯
সেকালের ঢাকার দোকানি ও লালখাতা হালখাতার গল্প ৭১
ঢাকার ছেলের সাহারা জয় ৭৩
ভরা যৌবনের ঢাকার আষাঢ় শ্রাবণের গল্প ৮০
মামু-ভাইগনার উইটি স্টোরি ৮২
সাঈদ আহমদ ও বিগ বেনের সহোদরের গল্প ৮৪
সুলতানা আলেকজান্ডারের সমাধি সৌধ ৮৬
বিলেতি খাবার প্রচলনের গল্প ৮৮
আরমানিটোলা গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে শরৎচন্দ্রের একদিন ৯১
কর্নেল ডেভিডসন ও ঢাকার জাত শাঁখাশিল্পীদের গল্প ৯৪
সুত্রাপুরের বিমল রায় ৯৬
একদা নজরুল ঢাকার জননেতা হতে চেয়েছিলেন ৯৮
তব নাম এই বলে খ্যাত হোক তুমি আমাদের লোক ১০১

আহমেদ রাশেদ

ঢাকাইয়া বুলি ১১৩
হোসেনী দালান ও মহররম ১২২
আমাদের হারিয়ে যাওয়া 'হাকলবেরি ফিন' ১২৬
রমজান ও ঢাকা ১২৯
ড'য়লীর দুইলাক নালাঃ একটি সমীক্ষা ১৩২
ইসলামপুরার খোঁজে ১৩৪
শহীদ মিনার, হামিদুর রাহমান এবং একটি ঢাকাইয়া প্রবাদ ১৩৯

ছবির অ্যালবাম ১৪৩

দেখা অদেখা ঢাকা

মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

সেকালের ঢাকার কাবুলিওয়ালা ও বোম্বাইয়া হাজীর গল্প

আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই আমাকে 'মাদার ইন মেনভিলের' (Mother in Manvill,Marjoriekenan Rawlings) জেরির মতো মনে হয়,যে কিনা বানিয়ে বানিয়ে অলীক সব গল্প বলে। আমার দাদী যখন আমাকে ঢাকার আগের দিনের গল্প বলতেন, তাকেও জেরীর মতো মনে হতো,"নির্ঘাত দাদু বানিয়ে চানিয়ে রং চড়িয়ে বলছেন। ঢাকার অবশ্য খুব বিখ্যাত একটি বানোয়টি কাহিনি ছিল। 'মায়া'। যেমনটি জাপানের Okaya শহরের মমোতারো (Momotaro, the peach boy)।

আমি দাদীর কাছে মায়ার গল্প শুনেছিলাম, বিস্মৃত হয়ে গেছি। একটি ক্লু পেলে পুরো গল্পটি আমার মনে পড়ে যাবে। আপাতত মায়ার মায়া ত্যাগ করে আপনাদের ঢাকার একটি মায়াবী সম্প্রদায়ের প্রবজ্যা জীবনের গল্প বলছি শুনুন। ঢাকার কাবুলিওয়ালাদের গল্প।

এক অজানা কারনে ব্রিটিশরা আফগানিদের খুব ভয় পেত। ব্রিটিশ রাজ আফগান বর্ডারে একটি সাইনবোর্ড টাংগিয়ে দিলো "It is absolutely forbidden to cross this border into Afghan territory"

ব্রিটিশ চক্রান্তে কাবুলিরা একঘরে হয়ে গেল। আমদানি রপ্তানি বন্ধ অগত্যা কাবুলিওয়ালারা দেশান্তরি হলো ভাগ্যান্বেষণে। সরহাদ পার হয়ে পাঞ্জাব মেলে চেপে দলে দলে কাবুলিরা ভিড় জমাতে লাগল প্রাণোচ্ছল ঢাকা ও কলকাতায়। মাথায় বারবন্ধি মোড়াছা পাগড়ী বাঁধা আফগানিরা ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে অবতরণ করে প্রচণ্ড জন-কলরব শুনে ঢাকার নাম দিলো 'মান্তাখ আত তায়ের'। 'পাখিদের সম্মেলন'। কাবুলি গোষ্ঠী দলে দলে ডেরা বাঁধলো বংশাল এলাকায়। নাজিরা বাজার, মালিটোলা, সিদ্দিক বাজার, বংশাল, কাজী আলাউদ্দিন রোডে যুথবদ্ধভাবে বাড়ি ভাড়া নিল।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করা কাবুলিদের মজ্জাগত। মাহরাম কাঁচের ছিলিমে আফিম পুড়িয়ে একটি লম্বা টান দিয়ে, কুলচা নামে এক ধরনের হোমমেইড বিস্কুট ও নাবাত বা মিছরির ডেলা দিয়ে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়ত ওরা কাজে। কাজ বলতে শুকনো ফল, বাদাম,ও হিং বিক্রি করা এবং চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া। কেউ কেউ ইন্সটলমেন্টে কাপড় ফেরি করে বেচত। লুঙ্গি, শাড়ি, ফতুয়া, পাঞ্জাবি ইত্যাদি নানান পরিধেয় ফেরি করত আর মাসে বা সপ্তাহে দুই আনা, চার আনা

ইন্সটলমেন্ট আদায় করত। ওরা খুব পাকা হিসেবি ছিল। ঋণ দেবার সময় লেখাপড়ির কোনো বালাই নেই, মুখের কথাই যথেষ্ট। দেনাপাওনার হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে রাখত। কাবুলিওয়ালা কখনো টাকার অংক উনিশ বিশ করেছে ঢাকার মানুষ কখনো শোনেনি। ওরা ছিল খুব সহজ সরল আর এক কথার মানুষ। মানুষকে খুব সহজে বিশ্বাস করত কিন্তু একবার বিশ্বাসে চির ধরলে আর কখনো সেই বিশ্বাস ভঙ্গকারীর ধারে কাছেও যেতো না।

তেতাল্লিশের মনন্বতরে, ব্রিটিশ দুঃশাসনে যখন মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে, তখন ওরা ছিল 'জরুরত জিয়াদ আস্ত'। ঢাকার প্রান্তিক মানুষের কাছে কাবুলিওয়ালারা সেই সময়কালে ছিল ফেরেশতার মতো। জরুরি প্রয়োজনের বন্ধু। সেই দুঃখের দিনগুলোতে গায়ে ঢিলেঢালা কাবুলি কুর্তা সালোয়ার পরিধান করা, মোটা গোফঁ ও শ্মশ্রুমন্ডিত প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এই দশাসই কাবুলিওয়ালারা ঢাকার অলিগলিতে,দুয়ারে দুয়ারে এসে হাজির হতো পরিত্রাতার ভূমিকায়। প্রায়শই তারা বাচ্চাদের হাতে তুলে দিত মেওয়া, কিসমিস, আর বয়োবৃদ্ধদের সাথে জুড়ে দিত গল্প, উর্দু, হিন্দি,ইংরেজি, পশতুন ও বাংলা মিশ্রিত অদ্ভুত এক পাচঁমিশেলি ভাষায়।

হিজরি রজব মাস আসলে পরে কাবুলিওয়ালারা অবতীর্ণ হতো হজ এজেন্টের ভূমিকায়। বয়োবৃদ্ধদের সাথে চুক্তি হতো 'জাহাজে করে বোম্বে বন্দর হয়ে পবিত্র হজ করার ব্যবস্থা করে দেব, আমাদের পয়তাল্লিশ টাকা এজেন্ট ফিস দেবে। কাবুলিরা ঢাকার হজ গমনেচ্ছুদের বোম্বে নিয়ে গিয়ে জাহাজে করে হজে যাবার কার্ড সংগ্রহ করিয়ে দিতেন। বিনিময়ে তারা ফিস নিতেন। কোনো কোনো হজ পালনেচ্ছু ঢাকার হাজি সাহেব জাহাজে আসন স্বল্পতাহেতু হজ কার্ড না পেয়ে বোম্বে থেকেই ফেরত আসতেন, তাদেরকে সবাই সম্মান করে 'বোম্বাইয়া হাজি' বলে সম্বোধন করতেন। আমার দাদীর বাবা ছিলেন সেরকম একজন 'বোম্বাইয়া হাজি'।

সেকালের ঢাকার জীবন মঞ্চের আশ্চর্য কুশীলব কাবুলিওয়ালারা উৎসব পার্বণে আনন্দের অংশীদারও ছিল। ঈদের দিনে ঢাকার অন্যতম আকর্ষনীয় বিষয় ছিল কাবুলি ওয়ালাদের নাচ। সেদিন ওরা আরমানিটোলা মাঠে শিশুর মতো আনন্দে উদ্বেল হয়ে, হাতে বাহারি রুমাল বেঁধে, ঢোলের তালে তালে উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠত আর গলা ছেড়ে গাইত ঐতিহ্যবাহি আফগানি গান 'দে চান্দাগুলে গুন চানা দা, দে চান্দাগুলে গুন চানা দা'। কাবুলিওয়ালাদের নাচ-গান ঢাকার মানুষের ঈদ আনন্দকে দ্বিগুণ করে দিত। সেকালের ঢাকার গল্পে আজ সেই আনন্দের রেশ খুঁজে ফিরি।

ঢাকার ছেলে ভানু

লোকেশন - ফুলবাড়িয়া,ঢাকা

সময় - সকাল

সময়কাল -চল্লিশের দশক।

প্যাসেঞ্জার : আরে ও গাড়োয়ান!

গাড়োয়ান : আরে বাবু আপনে নেহি। দেখেন তো হালায় আমার গাড়ি ফালায়া ঐদিক কই যান? গাড়ি বুঝি চিনবার পারেন নাই। পারবেন কেমনে ঐদিন তো হালায় নাইক্কা।

প্যাসেঞ্জার - ক্যা ?

গাড়োয়ান : বাঘে খায়া ফালাইছে। হালায় মিউনিসিপ্যালটির তেন অর্ডার দিছে যে, কোনো সালার জানা গাড়ির ভিতরে লোহার চাক্কি লাগাইবার পারবনা।

প্যাসেঞ্জার - কেল্লেগা?

গাড়োয়ান- কেলা?এই যে রাস্তার ভিতরে আলকাতরা বিছাইছেনি,ঐটা হালার খারাপ হয়া যাইবার পারে।

প্যাসেঞ্জার - ও!

গাড়োয়ান- এলায় অর্ডার মাফিক রাবারের চাক্কিবি লাগাইছি, আবার এক পোচ রংবি দিছি। দেখেন হালায় গাড়ি কেমুন দাঁত বাইর কইরা হাসে।

'কৌতুক রাজ' ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঢাকার গাড়োয়ান' শীর্ষক এই রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। বাংলার ঘরে ঘরে বিপুল জনপ্রিয় এই কৌতুক নকশাগুলো তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকার সদরঘাট তল্লাটের পথে প্রান্তরে ঘুরে, তার এক প্রিয় অগ্রজের সাইকেলের ক্যারিয়ারে চেপে। সেই অগ্রজ ছিলেন রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানকারী মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ, ঢাকার ছেলে দিনেশ গুপ্ত। ১৯৩৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ২৫টি নকশার সমন্বয়ে এই রেকর্ডের জোকসগুলো যখন তিনি পাবলিক ফাংশনে ক্যারিক্যাচার করতেন তখন ঢাকার শ্রোতাদের মনে আনন্দের ফল্গুধারা বয়ে যেত। মঞ্চে দাঁড়িয়ে ২৮ইঞ্চি বুক চিতিয়ে যখন তিনি বলতেন, 'আমি ঢাকার পোলা ভানু', তখন তার এই সদর্প ঘোষণা শুনে শ্রোতাদের সিনা ঢাকার পালোয়ান পরেশনাথের মতো ফুলেঁফেপে ৫৬ ইঞ্চি হয়ে যেত।

ঢাকার ছেলে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল ১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট, দক্ষিণ মৈশুন্ডি মহল্লার 'শান্তিনিকেতন' নামের বাড়িতে। তার বাবা জিতেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঢাকার নবাব স্টেটের আম মোক্তার। মা সুনীতি দেবী ছিলেন প্রথম ভারতীয় ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস। প্রথমে পোস্টিং ছিল কলকাতায়,পড়ে প্রথম 'হিন্দু জেনানা গভর্নরস' পদে বদলি হয়ে ঢাকা চলে আসেন। সুনীতি দেবীর কাজ ছিল নিম্ন বর্ণের হিন্দু মহিলাদের নবাব বাড়ি নিয়ে গিয়ে নবাব পরিবারের মেয়েদের কাছ থেকে সহবত শিক্ষা দেওয়া। উনার মা খুব তেজস্বিনী ছিলেন। একবারের ছোট্ট একটি ঘটনা বলছি শুনুন। সুনীতি দেবী একটি ফিটন গাড়িতে যাতায়াত করতেন। কয়েকদিন ধরে তিনি লক্ষ্য করলেন এক পুলিশ তার ফিটনের পাদানিতে চড়ে বসে। কিছুদূর গিয়ে তারপর নেমে পড়ে। এরকম পরিস্থিতি বেশ কয়দিন ধরে চলল,একদিন তিনি গারোয়ানকে বললেন, 'তুমি এই পুলিশটাকে উঠতে দাও কেন?' গাড়োয়ান জবাবে বলল, 'কি করুম কন মেমসাব ডরের চোটে কিছু কইবার পারি না, হালায় পুলিশ মানুষ,কি কইরা ফালায় কওন যায় না।'

পরের দিন যখন পুলিশটা একই রকম ভাবে ফিটন গাড়ির পাদানিতে উঠে বসলো তখন তিনি জানলা খুলে তাকে বললেন, 'তুমি রোজ আমার ঘোড়ার গাড়ির পাদানিতে উঠে পড়ো কেন?' পুলিশটা জবাবে বলল, 'আপনি চুপ করে বসুন, আপনার কোন অসুবিধা হবে না।' ভানু বন্দোপাধ্যায়ের মা কোন বাক্যব্যয় না করে দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে পুলিশকে রাস্তায় ফেলে দিলেন, তারপরে গাড়ি থামিয়ে নেমে ভূপতিত পুলিশটাকে বললেন, 'আর কোনদিন যেন না দেখি।' একথা শুনে হতবিহ্বল পুলিশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সুনীতি দেবীর রোষাবিষ্ট চেহারার দিকে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভয়ডরহীন চিত্ত মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। কাজের সূত্রে মা বাবা দু'জনেরই ঢাকার নবাব বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাই মহল্লার সবাই তাদের পরিবারকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। জন্মের সময় ভানু বন্দোপাধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছিল সাম্যময়। নামটি রেখেছিলেন সরোজিনী নাইডুর বাবা অঘোরনাথ চট্টরাজ যিনি সম্পর্কে ভানু বাবুর নানাভাই যোগেন্দ্র চট্টরাজের খুড়তুতো ভাই ছিলেন। যোগেন্দ্র চট্টরাজ ছিলেন 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' নামক একটি বইয়ের রচয়িতা। বইটি সেই সময় কালে স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। "ইন্ডিয়ান মিরর হিস্ট্রি"নামের একটি বইও তিনি লিখেছেন,সেই বইতে তিনি ব্রিটিশদের ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডিকে (অন্ধকূপ হত্যা) মিথ্যা প্রমাণ করেন। ব্রিটিশ সরকার এই বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

তাই ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ছিল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মজ্জাগত। ছেলেবেলায় ঢাকার বিখ্যাত সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে পড়ার সময়কাল থেকেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছেন নানা যোগেন্দ্র চট্টরাজ ও দীনেশ গুপ্তের অনুপ্রেরণায়। দীনেশ গুপ্তের হয়ে খুদে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে তিনি রপ্ত করেন ঢাকার গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের কুট্টিভাষা ও কুট্টিকৌতুক, যা কালক্রমে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে ভানু বন্দোপাধ্যায়কে কালোত্তীর্ণ 'কৌতুক রাজ' মর্যাদায় আসীন করেছিল। ঢাকার এই উইটি কুট্টি সম্প্রদায়ের কি সাংঘাতিক সেন্স অফ হিউমার

ছিল তা আজকের যুগে কল্পনাও করা যায় না। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক অভিনেতা হয়ে ওঠার পেছনে এদের অবদান সবচেয়ে বেশি। ঢাকাইয়া কুট্টিদের কাছে শোনা গল্পগুলো তিনি বাড়িতে, মহল্লাতে, স্কুলে শোনাতেন এবং বাহবা কুড়াতেন। ভানু বন্দোপাধ্যায়ের মুখে ঢাকার সরস কুট্টিদের একটি উইটি জোকস বলছি শুনুন: 'সদরঘাটের সন্নিকটে শাঁখারী বাজারে এক শ্রাদ্ধ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছে এক ঢাকাইয়া কুট্টি। খানিকক্ষণ পর সে একজনকে জিজ্ঞেস করে,' যার ছেরাদ্দ তারে তো কই দেহি না? 'ভদ্রলোক বললেন,' তিনি মরিসেন। 'কুট্টি' আ হা হা! মরলেন কি কইরা? 'ভদ্রলোক বলেন,' সর্পাঘাতে। 'কুট্টি' তা সাপটা কামড়াইছিল কুনহানে? 'ভদ্রলোক' কপালে। 'কুট্টি' যাউকগা, চক্ষু দুইটা বাইচ্চা গেছে!'

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স যখন আট-নয় বছর তখন থেকেই তিনি দীনেশ গুপ্তের ছায়া সঙ্গী। দীনেশ গুপ্ত শহীদ হবার পর বছরখানেক চুপচাপ পড়াশোনায় মন দেবার চেষ্টা করেন। তখন তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাদের গোয়ালনগর মহল্লা ও সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা, খেলাধুলা,নাটক প্রভৃতি নিয়ে। সেন্ট গ্রেগরী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর জগন্নাথ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েশনে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন চাঁদের হাট। এখানে পড়াশোনা করা তখন ভীষণ গর্বের ব্যাপার। ভানু বন্দোপাধ্যায়ের জীবনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই সবুজ শ্যামলীমাময় ক্যাম্পাসে তিনি সংস্পর্শে আসেন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর এইচ.এল. দে, ডক্টর এস. কে. দে, কবি মোহিত লাল মজুমদার, ডঃ মোঃ শহীদুল্লাহ, কবি জসীম উদ্দীন, ডঃ জ্ঞান ঘোষ, রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পন্ডিত ব্যক্তিত্বদের। সত্যেন বসুর সাথে তার হৃদ্যতা ও ভালোবাসা তো প্রবাদপ্রতিম।

১৯৩৮ সালে দুর্যোগের ঘনঘটায় ছেয়ে গেল তার জীবন, মাত্র ২৬ বছর বয়সে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম তার দাদা মারা গেলেন। তার জীবন ওলটপালট হয়ে গেল, সংসারের ভার বহন করতে গিয়ে তিনি রাজনীতি থেকে সরে গেলেন। জীবন জীবিকার খোঁজে তখন ঢাকা রেডিওর শিল্পী হিসেবে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। 'দুনিয়ার হাল' নামে একটি প্রোগ্রাম হতো তখন ঢাকা রেডিওতে, সেই অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। এছাড়া কবিতা আবৃত্তি করতেন মোহিত লাল মজুমদার ও কবি জসীমউদ্‌দীনের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষক ছিলেন কবি জসীমউদ্‌দীন সেকথা আপনারা অবগত হয়েছেন। সংসারের হাল ধরতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাটেনডেন্স খুব একটা ভালো ছিল না। তাই সুযোগ পেয়ে একদিন কবি জসীমউদ্‌দীন বললেন, তুমি যদি এরকমভাবে ক্লাস কামাই করো তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় বসতে দেব না, আমি জানি তুমি প্রক্সি দেওয়াও। জবাবে ভানু বন্দোপাধ্যায় বললেন, স্যার তাইলে আমিও আপনের

কবিতা রেডিওতে কমুনা।' তাৎক্ষণিক রসালো জবাব পেয়ে কবি জসিম উদ্দীন হেসে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ডঃ মো. শহীদুল্লাহকে নিয়েও রসে টইটম্বুর একটি ঘটনা আছে ভানু বন্দোপাধ্যায়ের। ডক্টর মো. শহীদুল্লাহর বাবরি চুল, ঘাড় অবধি নামানো। তিনি হাঁটতেন বেশ দ্রুত গতিতে। যখন তিনি হাঁটতেন তখন ঝাঁকরা চুলগুলো বেশ ছন্দে ছন্দে লাফাত। এই দৃশ্য দেখে ভানু বাবু নাম দিলেন"টাট্টু ঘোড়া"। উনার এই কথা শুনে বন্ধুরা হাসতো। তিনি যখনই ভানু বাবুদের পাশ দিয়ে যেতেন তখনই বন্ধুরা হাসত। এরকম দু'চার দিন যাওয়ার পর একদিন ডঃ মো: শহীদুল্লাহ ভানু বন্দোপাধ্যায়কে ডেকে বলেন, এই ছোকরা তুমি আমায় ভেঙ্গাও কেন? তিনি তো শিক্ষকের প্রশ্ন শুনে চুপসে গেলেন। আবার বলেন তিনি, উত্তর দাও নইলে তোমায় আমি ছাড়বো না। উত্তরে ভানু বন্দোপাধ্যায় বললেন, 'না স্যার, আমি আপনেরে ভেঙ্গাইনা। ডঃ মোঃ শহিদুল্লাহ বললেন, তাহলে তোমার বন্ধুরা হাসে কেন?তখন বাধ্য হয়ে বললেন, স্যার আপনে হাঁটার সময় আপনার ঝাঁকড়া চুল গুলান লাফায়, এর লেগা আমি আপনের নাম দিছি টাট্টু ঘোড়া।' একথা শুনে শহীদুল্লাহ সাহেব অট্ট হাসি দিলেন।

ঢাকা রেডিও ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বেশ রমরমা দিন চলছিল। ১৯৪০ সাল। ঢাকা তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের উত্তপ্ত উনুন। রাজনীতির সাথে হাত মেলানোর জন্য আবার নিশপিস করে উঠলো ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত। অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখে জনসন রোডে এক ব্রিটিশ পুলিশ ইনফর্মারকে উত্তম মাধ্যম দিলেন ভানু বাবু। শহরে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির অপরাধের তকমা লাগিয়ে তার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গেল। তিনি ধরা পড়লে পরিবার-পরিজন অকূল পাথারে ভেসে যাবে তাই অনেক ভেবেচিন্তে, বুকে পাথর বেঁধে সিদ্ধান্ত নিলেন, ঢাকা ছেড়ে চলে যাবেন কলকাতায়। ছেলেবেলার বন্ধু গোপাল সপরিবারে একটি প্রাইভেট কারে করে যাচ্ছিল কলকাতায়। ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে সেই গাড়ির পেছনের সিটের পাদানিতে শুয়ে কলকাতায় রওনা দিলেন ভানু বন্দোপাধ্যায়। ১৯৪১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে শুরু হলো ঢাকার ছেলে ভানুর কলকাতা অধ্যায়।

১৯৪৬ সালে জাগরণ সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতার জয়যাত্রা শুরু হয়।

১৯৪৯ সালে বিমল রায় পরিচালিত মন্ত্রমুগ্ধ, প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত সেতু, ইত্যাদি সিনেমায় অনবদ্য অভিনয় করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন। ২৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। তার অভিনয়ের প্রাণ ছিল ঢাকার সংস্কৃতি ও ঢাকার শ্রুতি মধুর বাংলা ভাষা। ঢাকার এই প্রাণভোমরার প্রাণস্পন্দন থেমে গেল ১৯৮৩ সালের ৪ মার্চ তারিখে। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন, অনন্ত কাল ধরে, ঢাকাইয়া বাংলা ভাষার ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে।

ঢাকা থেকে মক্কা, সেকালের হজের গল্প

সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রথম ঘর, পবিত্র কাবা গৃহ। 'বাইতুল্লাহ'। আল্লাহর ঘর। ৭ জিলকাদ্ব ১৩১২, ৩ মে ১৮৯৫ সাল। চারদিন হলো ঢাকার হোসেনি দালানের সাধু হাজী ভূঁইয়া আল্লাহর ঘরের মেহমান হয়ে এসেছেন। তার মনে খুশির সীমা পরিসীমা নেই। আরব পেনিনসুলার দীর্ঘ এবং দুর্বিষহ ভ্রমণ ভোগান্তির ছিটেফোঁটাও নেই তার চেহারায়।

আরব পেনিনসুলা আসলে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির একটি অংশ। তপ্ত উষর ধুধু বালির সাহারা। সেকালে সাহারার স্পর্শে গাছ-পালা,তৃনরাজির অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেতনা। এই মরুভূমির শুধু বালুকা নয়,বাতাসও ভয়াবহ। এই বাতাস জীবনের রসকষ সব শুঁষে নেয়। সাহারার এই বিচিত্র বাতাসের নাম 'ট্রেড উইন্ডস'। এই ট্রেড উইন্ডস চলার পথের আগাগোড়া পোড়ামাটির দেশ 'আরব দেশ'।

এই রুদ্র তপ্ত দেশের ততোধিক রুদ্র সমুদ্র লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে জেদ্দা বন্দর হয়ে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' তাকবীর দিতে দিতে আল কাবা আল মুসাররাফায় পৌছেছেন সাধু হাজী ভূঁইয়া ও তার হজ সঙ্গী ঢাকার কাফেলা।

মক্কায় এসে পৌঁছেই প্রথমে জমজমের পানি দিয়ে গোসল করলেন,ওমরা করলেন,তারপর ছুট লাগালেন বাড়ি ভাড়া করতে। বাইতুল্লাহ থেকে ১৬ কিলোমিটার পুর্বে হোনায়েনের পথে অবস্থিত জুরনাহ উপত্যকায় দেখা পেলেন এক আরব বেদুঈনের। আল হাবিব ইবনে আব্বাস। ঢাকার হজ কাফেলা যে সদ্য এসেছে মক্কায় এবং বাড়ি খুঁজছে সে কথা বুঝতে পেরে আল হাবিব সাধু হাজীকে বলল,আমি মুজায়নাহ গোত্রের, খাঁটি বেদুঈন, তোমাদের কষ্ট করে বাড়ি খুজঁতে হবেনা। তোমরা আমার গরীব খানায় আতিথেয়তা গ্রহণ কর। মোটা ভুরু,দীর্ঘ নাসিকা, সুচাগ্র চিবুক, মধ্যম আকৃতির এই বেদুঈনের কথায় সাধু হাজী যারপরনাই আশ্বস্ত হলেন। আরব রীতি অনুযায়ী তারা কোলাকুলি করলেন,ঢাকা ও মক্কা ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হলো। সাধু হাজী ভূঁইয়া আমার প্রপিতামহ হন। মক্কার জন্য আপনার মনের প্রেমের সব দরজা, জানালা খুলে বসুন,বলছি শুনুন সেকালের হজ যাত্রার গল্প।

সেকালে হজে যাওয়ার উপায় ছিল দুটি; স্থলপথ ও জলপথ। স্থলপথে ভারতের দক্ষিন-পশ্চিম অংশ, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, মিশর হয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে জেদ্দা তথা মক্কায় পৌঁছাতে হতো। এই সড়কপথে এদেশীয় হজযাত্রীকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হতো।

সড়ক পথের পবিত্র হজ দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ১৭ শতকে শুরু হলো স্টীম শীপ সার্ভিস। হজের জন্য নির্ধারিত বন্দর ছিল গুজরাটের সুরাট, যা বাব-আল মক্কা বা বন্দর মুবারক নামেও পরিচিত ছিল। উনিশ শতকে আরো তিনটি বন্দর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বোম্বাই,কলকাতা আর করাচি। ঢাকাইয়াদের কাছে জনপ্রিয় ছিল বোম্বের প্রিন্সেস ডক হয়ে হজ যাত্রা।

১৯ শতকের দিকে ঢাকার হজযাত্রীদের বোম্বাই পৌঁছাতে হতো কিছুটা পথ ট্রেনে, মহিষের গাড়ি, দাঁড়টানা নৌকা বা পালকিতে চড়ে, কখনোবা পায়ে হেঁটে। বন্দরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়তেন, কেউবা দেরি হওয়ায় জাহাজ মিস করতেন। ঢাকার এই সব হজ যাত্রীরা জাহাজে উঠতে না পেরে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বন্দরে অপেক্ষা করতেন হজ ফেরত যাত্রীদের জন্য। তারা প্রহর গুণতো কবে ঢাকার হজ যাত্রীরা হজ পালন শেষে ফিরে আসবে তাদের মুখে হজের গল্প শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবে। বোম্বাইয়ে হজের জাহাজ ধরতে ব্যর্থ ঢাকাইয়ারা যখন ঢাকায় ফিরে আসত তখন তাদের সম্বোধন করা হতো 'বোম্বাইয়া হাজী' বলে। তাদের যুক্তি হজ করতে পারেনি তো কি হয়েছে, হজের নিয়ত করে তারা বাড়ি থেকে বের হয়েছে তাই বোম্বাইয়া হাজী।

১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ সরকার একটা কাজের কাজ করল। হজ এজেন্সি নিয়োগ দিলো টমাস কুক অ্যান্ড সন্সকে। কুক সাহেব হজের জন্য পারমিট, টিকেটিং, শিপিং এর ব্যবস্থা করল। উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের শুরুর দিকে টমাস কুক অ্যান্ড সন্সের কল্যানে উপমহাদেশের হজ যাত্রীরা একটু আরামের সাথে দীর্ঘ হজ যাত্রার সুযোগ পেলেন। আমার প্রপিতামহ সাধু হাজী টমাস কুক অ্যান্ড সন্সের জাহাজে করে পবিত্র হজ পালন করতে গিয়েছিলেন ১৮৯৫ সালে।

টমাস কুক এন্ড সন্সের জাহাজে খাবারের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন ছিল। খাসীর কোরমা ও কোফতা ছিল ২ আনা প্লেট, বিরিয়ানি ৫ আনা, শামিকাবাব ৬ পাই পয়সা, সেদ্ধ ডিম ৪ পাই পয়সা, হালুয়া-পরোটা ২ আনা প্লেট, এক গ্লাস দুধ ১ আনা, কমলালেবু ৬ পাইপয়সা, আপেল ১ আনা সেকালের টাকা পয়সার হিসেব ছিল বিচিত্র। ১৬ আনায় ১ টাকা এবং ১২ পাই পয়সায় ১ আনা। ১ টাকায় হাজী সাহেবের এক দিনের খাবার সংস্থান হয়ে যেত। টমাস কুক এন্ড সন্সের জাহাজে বোম্বাই থেকে প্রথম শ্রেণির হজ টিকেটের মূল্য ছিল প্রায় ৩২৫ টাকা, ২য় শ্রেণি ২১৯ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণি ১০৭ টাকা। আমার বড় বাবা সাধু হাজী ভূইয়াঁ কোন শ্রেণির যাত্রী হিসেবে হজ ভ্রমণ করেছিলেন সে তথ্য আমার জানা হয়নি।

১৯১২ সালে হজে গিয়েছিলেন খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনধারাতে' লেখেন, 'আমি করাচি বন্দরে গিয়ে জাহাজে উঠি। জাহাজে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণি ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণি ছিলনা। প্রথম শ্রেণির টিকেটের দাম ৪৫০ টাকা। হজ যাত্রার সময় আহসান উল্লাহ সাহেব ইয়েমেনের কাছে প্রলয়ংকরী সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়েন। সেই ঝড়ে জাহাজ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হাজী সাহেবরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।